মেঘ বৃষ্টি

অমল কর

প্রচন্ডদাবদাহ। কুকুরের লকলকে জিব প্রায় চার ইঞ্চি বাইরে--হা-এর সাথে লালা ঝরছে। গুটি কয়েক কাক জানালার পাশে বুড়ো আমগাছটায় কা কা করছে, ক্রমাগত বিষ্ঠায় পাতা সাদা। আওয়াজ তো নয়--যেন বলছে 'খা' 'খা'। 'শিলকাটাও' শব্দকারী আজ উধাও। 'থালাবাসুন' বলে বিচিত্র সুরে হাঁক দেবার আজ কেউ নেই। টুক্ করে বকুল গাছ থেকে একটা পাতা খসে পড়ল হেলতে দুলতে বিচিত্র ঢঙে--যেন 'সতরঞ্চি ঘুড়ি' লাটাই ছাড়া হয়ে দোল খেতে খেতে আকাশ ছেড়ে মাটিতে আশ্রয় নিল। দূরে কোথাও কোন জলাশয়ে প্রচন্ড তাপ সইতে না পেরে ভেসে ওঠা কোন মাছের উপর অনেক উঁচু থেকে ছোঁ মেরে উধাও এক গাঙচিল ক্লান্ত ডানা মেলে কোন এক নিরাপদ গাছের খোঁজে। জানালায় চোখ রাখা যাচ্ছে না, চোখ-চামড়া ঝল্সে আসছে। একটুও হাওয়া নেই, নড়ছে না গাছের পাতা। দূরে থেকে এক ঘেয়ে নিরবচ্ছিন্ন আর্তরব কুবো পাখির 'কুব্' 'কুব্'। রাস্তার পিচ্ গলে কেমন যেন একটা সোঁদা গন্ধ--অনেকটা মর্গের পচা লাশের মত।

ফ্যানের হাওয়া তো নয়! যেন হাপরের গনগনে অগ্নিস্পর্শ। বিষণ্ণভাবে ফ্যানের দিকে তাকায় অজয়--সন্দিহান, সজোরে ঘুরছে তো! রেগুলেটারটাও একবার দেখে নেয় সন্দেহ নিরসনে। হাতপাখাটা কুঁজোর জলে ভিজিয়ে নিল অজয়। হাওয়া যেন লু, হাত টন টন। গলায় ঠান্ডা জল ঢাললো--গলা পুড়ে যায় আর কি! চা পাতা মেশালে বিনা তাপে লিকার। মাসিক একটা লিট্ল ম্যাগাজিন টেনে নিল অজয়। যদি অন্যমনস্কতায় খানিকটা গরম কম লাগে। 'গোল্ডেন হ্যান্ডশেক' অজয়কে তেল ফুরাবার আগে বাতি নেবানোর মত চার বছর আগেই বলিষ্ঠ দু'টো হাত আর অসীম কর্মক্ষমতা থাকা সত্বেও নিথর করে দিয়েছে। প্রতিবাদ-প্রতিরোধ মিটিং-মিছিল কার্যত ব্যর্থ। অজয়ের জ্বালাময়ী যুক্তি-বক্তব্য ধোপে টেকেনি। এ-বেদনা অজয়কে অহর্নিশ কুরে কুরে খায়।

স্ত্রী নন্দিতা, এখনও চাকরী করে। এতো তাপপ্রবাহে অফিসে যাবার ইচ্ছে ছিল না। 'নন্দা আজ বোধহয় গায়ে ফোস্কা পড়বে। ডুব মেরে দাও।' বলেছিল অজয়। সায় দিতে পারতো নন্দিতা। কিন্তু কদিন ডুব মারবে! তবুও বলেছিল নতুন প্রজেক্ট এর সুলুক সন্ধানে কোন এক ওপর ওয়ালা আসবে। যেতেই হবে। তাছাড়া ক'দিন সঙ্গ দেবে নন্দিতা অফিস কামাই করে?

একা লাগে, বড্ড একা লাগে। দুপুরের বাড়-বাড়ন্ত গরমটা একাকীত্ব বাড়িয়ে দেয়। তিল তিল করে একমাত্র মেয়ের মৃত্যু মনে পড়ে যায়। নিঃসঙ্গতা গরমের ভ্যাপ্সা ভাবটাও যেন আরও বাড়ায়। একদিন অজয় বিরক্ত হয়ে বললো, 'আচ্ছা! ঘামের দুর্গন্ধ সুবাস হলে কি ক্ষতি হতো বলোতো!' নন্দিতা শুনে রস করে বলে 'তোমার যত আদিখ্যেতা। জোব চার্ণকের কলকাতায় তুমি বোধহয় ব্যতিক্রমী পাগল।' অজয় কথা বাড়ায়নি। নন্দিতা নাচনেওয়ালী নদীর মতো কথাগুলো বলে কেমন যেন মজা পায়। অজয় জ্বলে। কথাটা মনে পড়ায় প্যাচ প্যাচ্ ঘাম আরও পীড়া বাড়ায়। মনে মনে শানায়, জবাব দেবে সুযোগে।

পাশের বাড়িতে টেপ-ডেক উচচকিত শব্দে বাজছে--গোদের উপর বিষফোঁড়া। ‘ কেন বাপু, তোমার ভাল লাগার তুমি শুনে মজা লোটো, মচ্ছোব করো! উলোল উল্লোল আলটপকা স্বাধীনতার উদ্দাম রকেট নাচ কেন হে! কান ঝালপালা করার তুমি কে হে বাপু! গণতন্ত্র! উচ্ছন্নে গেলো। এ কী! এ কোন্ দেশ! এ কী বেঁচে থাকা!’ অজয় নিষ্ফল আক্রোশে ভাবে আর ছটফটানি, প্রতিবাদ করবেই। প্রতিবাদ করলে পক্ষে-বিপক্ষে দাদা বা দল যাবে জুটে। অজয় আবার তাও ভাবে। নন্দিতা এসব ঝুট্‌ঝামেলা আর অকারণ দৌড়ছুট পছন্দ করে না। কিন্তু অজয় আবার বিরক্তির সাথে ভাবে--পৃথিবীটা কি বাসযোগ্য হবে না! এ কি মগের মুল্লুক! যা খুশী তাই চলবে! মোচ্ছবের হাঙ্কাফুঙ্কো খোলাহাটের হুল্লোড়বাজি আর আদিখ্যেতা-ন্যাকামি মানতে হবে! তাও যদি একটাও গানের কলি শোনা বা বোঝা যেতো। কানাড়া-নাকাড়া-জগঝম্পের দামামায় ‘হাও’ ‘হাও’ শব্দ ছাড়া বাকীগুলো ঢক্কা নিনাদ। ছেলেটি আবার ডাকাবুকো। কাউন্সিলরের সুযোগ্য পুত্র! প্রতিবাদে বাদ জ্বলতে পারে।

একবার কোত্থেকে এক আধ-মরা সাপ এনে রাস্তায় ফেললে মুখর হয়েছিল অজয়। ওটুকু ছেলে বলে ‘ কেন কপ্‌চাচ্ছেন? যান না মশায়, শু’তে ভালো না লাগে হেদুয়ায় গিয়ে চিৎ সাঁতার দিন।’ অজয় বোঝাবার চেষ্টা করে ‘ দেখো, অনেক সময় গরীব-গুর্বো অভাব-দারিদ্র্য-জারিত মানুষ তো খালি পায়ে হাঁটে।’ ফোঁস করে উঠে বদতমিজ ছেলেটি তাৎক্ষণিক জবাব দেয়, ‘ওই হোই হোই হোই, ওসব জ্ঞান আর গুলগপ্পো মাল্টুকে দেবেন না। ইত্‌না যদি দরদ, মরদ হো তো জুতো কিনে দেবেন।’ অজয় আবার বলার চেষ্টা করে ‘তাছাড়া মেয়েরা ভয় পেতে পারে।’ সপাটে উত্তর ‘চড়কা যদি না জোটে তেল লাগাবার, কাপড় কাচুন গে। পাবলিক রাস্তায় ফেলেছি, আপনার টনটন করছে কেন?’ কথা বাড়ায়নি অজয়। অনুযোগ-তম্বির দরকার ছিল না। নন্দিতা শুনে বেজায় রেগে অজয়কে ধমকেছে ‘একটা নোংরা ইতরকে তুমি নীতিকথা শোনাতে গেছে? তোমাকে অপমান করার সুযোগ দিলে? কি দরকার তোমার ওসব ঝক্কির? আরও তো লোক ছিল!’ হ্যাঁ ছিল। অজয় সেদিন কোন জনসমর্থন পায়নি।

আজও প্রতিবেশীদের সমর্থনের লেশমাত্র আশা নেই। তবুও বলবেই অজয়। এবার অজয় কাগজে লিখে প্রতিবাদ জানাবে। ফলশ্রুতি হয়তো অত্যাচার, তবুও। এ-জীবন এমনি করে আর সয়না। অজয় নিজেকে ব্যতিক্রমী মানুষই মনে করে।

হাত থেকে পড়ে যাওয়া হাতপাখাটা তুলতে গিয়ে ‘ঝড়ো হাওয়া’ সাহিত্য পত্রিকাটি মাটিতে পড়ে গেলো। পত্রিকাটা তুলতে গিয়ে বেসামাল হয়ে চেয়ারটা গেলো সরে। টাল মাটাল হয়ে চোখ থেকে চশমটা ছিট্‌কে পড়লো মেঝেতে। গতবার পুজোয় নন্দিতার দেওয়া। বাইফোকাল। বই পড়তে লাগে! পুরানো মডেল বলে অনেকে হাসে। হাসুক। বিলম্বিত দুপুরে অজয়ের মতো নিঃসঙ্গ মানুষের একাকীত্ব ঘোচানো আর বেলা-ফুরানোর প্রতীক্ষার অব্যক্ত বিড়ম্বনা প্রশমনে চশমা আর বই নিত্য প্রয়োজন।

হঠাৎ ফোন বেজে উঠলো ক্রীং ক্রীং। অজয় সময় নেয়। বাজুক। গরমে এ-শব্দ নৈঃশব্দ্য ভাঙে, একটু বৈচিত্র্য আনে। মিনিট দশেক হলো কান ফাটানো নিনাদ বন্ধ হয়েছে। কোন ইয়ারবন্ধু এসে থাকবে অথবা অন্য কিছু। ফ্যানের গম্ গম্ শব্দ ছাড়া কানটা হাল্কা লাগছিলো। উঠল অজয়। আলস্য ভাঙলো। গয়ং গচ্ছ করে রিসিভার তুললো, “হ্যালো”।

কোন্ সুদূরের নিজন পুর থেকে ভেসে উঠলো এক কৌতুহলী স্বর ঃ ‘তুমি কে? কে গো তুমি?’

অজয়ের মনে হলো কোন ছোট মেয়ের গলার স্বর। মনে পড়ে গেলো সাত বছর বয়সে লিউকোমিয়ায় প্রয়াত অজয়ের মেয়ে মাম্পির কথা। বুকের ভেতর আর্তনাদ, হাহাকার করে উঠলো। ‘আমি? মেঘ, নদী কিংবা পাহাড়।’ দার্শনিকের মতো বললো অজয়।

‘ ধ্যেৎ! তুমি কি বোকা গো! কারো নাম কখন মেঘ, নদী, পাহাড় হয় না কি! এসব কি বলছো?’ ঝরনার জল ঝরঝরিয়ে পতনের মতো হি হি করে একগাল হাসলো মেয়েটি।
‘তুমি কে ছোট্ট সোনা?’ অজয়ের গলায় আদর।
‘আমি? আমি নিনা।’ অস্ফুট এক গানের কলি।
‘তুমি কোন্ ক্লাসে পড়?’ ভাব জমাতে চায় অজয়।
‘আমি? আমি পড়ি না। আমি তো এখন চোখে ভালো দেখতে পাই না। তাছাড়া আমার অসুখ।’ একটা বিষণ্ণ সুর।
মনটা কেমন করে উঠলো। না থেমে আবার জিজ্ঞেস করে অজয় ‘ তোমরা কোথায় থাকো?’ অনেক আর্তি, অনুসন্ধিৎসা।
‘আমরা? যাদবপুর।’ গলায় হতাশা।
‘তুমি আমার নম্বর জানলে কি করে?’ চরম কৌতুহল অজয়ের।
‘জানি না তো? আমি আন্দাজে আঙুল দিয়ে টিপে টিপে ফোন করেছি। আমার তো দুপুরে বড্ড কষ্ট হয়! বড্ড গরম। দেখো না মেঘ জমেছে কিনা আকাশে, বৃষ্টি হবে কিনা?’ ওর কণ্ঠে আবেগ, উৎকণ্ঠা।
অজয় প্রশ্ন করে ‘ তোমার ফোন নম্বর কত?’ ইচ্ছে, চিরস্থায়ী ভাব জমাবার। ফোন-বন্ধু নিঃসঙ্গতায়।

‘ফোর এইট থ্রী.....এই রে, বাবা আসছে, বকবে।’ কেটে যায় লাইন।
‘‘হ্যালো, হ্যালো, হ্যালো।’’ নিশ্চুপ ওপ্রান্ত।
সুন্দর একটা গলা। যেন একটা সুরেলা গান শুনছিল অজয়। ব্যথার গান, পূরবী। হলো না শোনা। বোবা ব্যথায় ককিয়ে উঠলো মনটা অজয়ের। আহারে! কতটুকু মেয়ে কে জানে? চোখে দেখতে পায় না! স্কুলে যায় না! বাড়ীতে অসুস্থ শরীরে ছট্‌ফটিয়ে বেড়ায়। কলে ইঁদুর পড়ার মতো। মৃত মাম্পি রোগের যন্ত্রণায় এমনিই ছট্‌ফটিয়ে দাপিয়ে বেড়াতো। নিনার পৃথিবীর রূপ, রং, বর্ণ সব মুছে গেছে। ও আর পাহাড় দেখতে পায় না, ঝরনা দেখতে পায় না, পাখিপশু দেখতে পায় না, সমুদ্র দেখতে পায় না, পড়তে পারে না, বন্ধুদের সাথে খেলতে পারে না। জন্মান্ধ নয়। পেয়ে হারানোর বেদনা। ও আর চঁাদের রোশনাই দেখে না। শুধু নিকষ কালো অন্ধকার। দিনরাত অমাবস্যা। কোন্ রোগে, কে জানে!

আচ্ছা, এমনও তো হতে পারে, অজয় ভাবে, একটা চোখ দান করলে কেমন হয়? অনেক দেখেছে অজয় এতাবৎকাল। প্রাকৃতিক শোভা, মানুষের স্খলন, পতন। কী হবে এ-পড়ন্ত বেলায় দু’টি চোখ দিয়ে? কতো মানুষ তো মরণোত্তর দেহ দান করে, চোখ দান করে, জীবদ্দশায় রক্তদান করে, কিডনী দান করে। একটা চোখ দিলে থাকে তো আর একটা! না হয় পাথর চোখ বসিয়ে নেবে! কতো মানুষ তো চোখ থাকলেও ঠুলি প’রে থাকে--পাপ, ব্যভিচার, অনাচার, অত্যাচার দেখেও চোখকে বলে দেখিস্ না। কিন্তু..... চোখ দেবে কাকে? ফোনটা তো ছেড়ে দিল। পরিচয় জানা গেলো না। কাগজে বিজ্ঞাপন দিলে হয় না! কিন্তু কি লিখবে? ভাবে অজয়। বেঁচে থেকে চোখ দান করার পদ্ধতিও ছাই জানা নেই অজয়ের। তাহলে? কালকেই একটা খোঁজ নেবে অজয়।

ভারাক্রান্ত মনটা আরও বিষিয়ে গেলো। দহন বাড়লো আরও। কোনো মতে পায়ে পায়ে জানালার দিকে এগিয়ে গেল অজয়, যেন নিস্প্রাণ দেহ। মনে পড়ে গেল মৃত মাম্পির মুখ। দেখতে চেষ্টা করলো ছোট্ট সোনা বন্ধুর কাঙ্খিত মেঘ আকাশে আছে কিনা, বৃষ্টি হবে কিনা।

বুঝতে পারলো অজয়, বাইরে নয়, অজয়ের মনের গভীরে বিষাদের ঘন কালো মেঘ।
আস্তে আস্তে গাল বেয়ে অজয়ের দু’চোখ থেকে অঝোরে বৃষ্টির ধারা নেমে এলো।

सृष्टिसन्धान

Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com